আদর্শ হিন্দু হোটেল

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

গ্রন্থতীর্থ
৬৫/৩এ, কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা — ৭০০ ০৭৩

॥ আদর্শ হিন্দু-হোটেল ॥

রাণাঘাটের রেল-বাজারে বেচু চক্কত্তির হোটেল যে রাণাঘাটের আদি ও অকৃত্রিম হিন্দু-হোটেল এ-কথা হোটেলের সামনে বড় বড় অক্ষরে লেখা না থাকিলেও অনেকেই জানে। কয়েক বছরের মধ্যে রাণাঘাট রেল-বাজারের অসম্ভব রকমের উন্নতি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হোটেলটির অবস্থা ফিরিয়া যায়। আজ দশ বৎসরের মধ্যে হোটেলের পাকা বাড়ী হইয়াছে, চারজন রসুয়ে-বামুনে রান্না করিতে করিতে হিম্‌শিম্ খাইয়া যায়, এমন খদ্দেরের ভিড়।

বেচু চক্কত্তি (বয়স পঞ্চাশের ওপর, না-ফর্সা না-কালো দোহারা চেহারা, মাথায় কাঁচা-পাকা চুল) হোটেলের সামনের ঘরে একটা তক্তপোশে কাঠের হাত-বা'রে ওপর কনুয়ের ভর দিয়া বসিয়া আছে। বেলা দশটা। বনগাঁ লাইনের ট্রেন এইমাত্র আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। কিছু কিছু প্যাসেঞ্জার বাহিরের গেট দিয়া রাস্তায় পড়িতে শুরু হইয়াছে।

বেচু চক্কত্তির হোটেলের চাকর মতি রাস্তার ধারে দাঁড়াইয়া হাঁকিতেছে—এই দিকে আসুন বাবু, গরম ভাত তৈরি, মাছের ঝোল, ডাল, তরকারী, ভাত—হিন্দু-হোটেল বাবু—

দুইজন লোক বক্তৃতায় ভুলিয়া পাশের যদু বাঁড়ুয্যের হোটেলের লোকের সাদর আমন্ত্রণ উপেক্ষা করিয়া বেচু চক্কত্তির হোটেলেই ঢুকিল।

—এই যে, বোঁচকা এখানে রাখুন। দাঁড়ান বাবু, টিকিট নিতে হবে এখানে—কোন্ ক্লাসে খাবেন? ফাস্ট ক্লাস না সেকেন্ ক্লাস—ফাস্ট ক্লাসে পাঁচ আনা, সেকেন্ ক্লাসে তিন আনা—

এ হোটেলের নিয়ম, পয়সা দিয়া বেচু চক্কত্তির নিকট হইতে টিকিট (এক টুক্‌রা সাদা কাগজে—নম্বর ও শ্রেণী লেখা) কিনিয়া ভিতরে যাইতে হইবে। সেখানে একজন রসুয়ে-বামুন বসিয়া আছে, খদ্দেরের টিকিট লইয়া তাহাকে নির্দিষ্ট স্থানে বসাইয়া দিবার জন্য। খাইবার জায়গা দরমার বেড়া দিয়া দুই ভাগ করা। এক দিকে ফাস্ট ক্লাস, অন্য দিকে সেকেন্ ক্লাস। খদ্দের খাইয়া চলিয়া গেলে এই সব টিকিট বেচু চক্কত্তির কাছে জমা দেওয়া হইবে—সেগুলি দেখিয়া তহবিল মিলানো ও উদ্বৃত্ত ভাত তরকারীর পরিমাণ তদারক হইবে, রসুয়ে-বামুনেরা চুরি করিতে না পারে।

চাকর ভিতরে আসিয়া বলিল—মোটে চার জন লোক খদ্দের। দু'জন ওদের ওখানে গেল।

বেচু চক্কত্তি বলিল—যাক্ গে। তুই আর একটু এগিয়ে যা—শান্তিপুর আসবার সময় হ'ল। এই গাড়ীতে দু-পাঁচটা খদ্দের থাকেই। আর ভেতরে বামুনকে বলে আয়, শান্তিপুর আসবার আগে যেন আর ভাত না চড়ায়। এক ডেক্‌চিতে এখন চলুক।

এমন সময় হোটেলের ঝি পদ্ম ঘরে ঢুকিয়া বলিল—পয়সা দেও বাবু, দই নে আসি।

বেচু বলিল—দই কি হবে?

পদ্ম হাসিয়া বলিল—একজন ফাস্টো কেলাসে খাবে। আমায় বলে পাঠিয়েছে। দই চাই, পাকা কলা চাই—

বেচু বলিল—কে বল্ তো? খদ্দের?

—খদ্দের তো বটেই। পয়সা দিয়ে খাবে। এম্‌নি না। আমার ভাইপো আসবে দেশ থেকে এই শান্তিপুরের গাড়ীতে।

—না—না—তাকে পয়সা দিতে হবে না। সে ছেলেমানুষ, দু-এক দিনের জন্যে আসবে—তার কাছ থেকে পয়সা কিসের। দইয়ের পয়সা নিয়ে যা—

বেচু একথা কখনো কাহাকেও বলে না, কিন্তু পদ্ম ঝিয়ের সম্বন্ধে অন্য কথা। পদ্ম ঝি এ হোটেলে যা বলে তাই হয়। তাহার উপর কথা বলিবার কেহ নাই। সেজন্য দুষ্ট লোকে নানারকম মন্দ কথা বলে। কিন্তু সে-সব কথায় কান দিতে গেলে চলে না।

শান্তিপুরের গাড়ী আসিবার শব্দ পাওয়া গেল।

হোটেলের চাকর খদ্দের আনিতে স্টেশনে যাইতেছিল, বেচু চক্কত্তি বলিল—খদ্দের বেশী করে আনতে না পারলে আর তোমায় রাখা হবে না মনে রেখো—আমার খরচা না পোষালে মিথ্যে চাকর রাখতে যাই কেন? গেল হপ্তাতে তুমি মোটে তেইশটা খদ্দের এনেছ—তাতে হোটেল চলে?

পদ্ম ঝি বলিল—তোমায় পই-পই ক'রে বলে হার মেনে গেলাম; তিন আনা বাড়িয়ে চোদ্দ পয়সা করো, আর ফাস্টো কেলাস্-টেলাস্ তুলে দ্যাও। ক'টা খদ্দের হয় ফাস্টো কেলাসে? যদু বাঁড়ুয্যের হোটেলে রেট্ কমিয়েছে—শুনে—

বেচু বলিল—চুপ চুপ, একটু আস্তে আস্তে বল্ না। কারও কানে কথা গেলে এখুনি—

এমন সময় ছ'জন খদ্দের সঙ্গে করিয়া মতি চাকর ফিরিয়া আসিল।

বেচু বলিল—আসুন বাবু, পুঁটুলি এখানে রাখুন। কোন্ কেলাসে খাবেন বাবুরা? পাঁচ আনা আর তিন আনা—

একজন বলিল—তোমার সেই বামুন ঠাকুরটি আছে তো? তার হাতের রান্না খেতেই এলাম। আমরা সে-বার খেয়ে গিয়ে ভুলতে পারি নে। মাংস হবে?

—না বাবু, মাংস তো রান্না নেই—তবে যদি অর্ডার দেন তো ওবেলা—

লোকটি বলিল—আমরা মোকদ্দমা করতে এসেছি কিনা, যদি জিতি পোড়ামা আর সিদ্ধেশ্বরীর ইচ্ছেয়—তবে হোটেলে আমাদের আজ থাকতেই হবে। কাল উকীলের বাড়ী কাজ আছে—তা হ'লে আজ ওবেলা তিন সের মাংস চাই—কিন্তু সেই বামুন ঠাকুরকে দিয়ে রান্না করানো চাই। নইলে আমরা অন্য জায়গায় যাব।

ইহারা টিকিট কিনিয়া খাইবার ঘরে ঢুকিলে পদ্ম ঝি বলিল—পোড়ারমুখো মিন্‌সে আবার শুনতে না পায়। কি যে ওর রান্নার সুখ্যাত করে লোকে, তা বলতে পারি নে—কি এমন মরণ রান্নার!

বেচু বলিল—টিকিটগুলো নিয়ে আয় তো ভেতর থেকে। এ-বেলার হিসেবটা মিটিয়ে রাখি। আর এখন তো গাড়ী নেই—আবার সেই একটায় মুড়োগাছা লোকাল—

পদ্ম বলিল—কেন আসাম মেল—

—আসাম মেলে আর তেমন খদ্দের আসছে কই? আগে আগে আসাম মেলে আটটা-দশটা ফি দিন পাওয়া যেত—কি যে হয়েছে বাজারের অবস্থা—

পদ্ম ঝি ভিতরে গিয়া রসুয়ে-বামুনের নিকট হইতে টিকিট আনিয়া বলিল—শোনো মজা, ফাস্টো কেলাসের ডাল যা ছিল সব সাবাড়। হাজারি ঠাকুরের কাণ্ড! ইদিকে এই খদ্দের বাবুরা গিয়ে তাকে একেবারে স্বগ্‌গে তুলে দিচ্ছে, তুমি হেনো রাঁধো, তুমি তেনো রাঁধো ব'লে—যত অনাছিষ্টি কাণ্ড, যা দেখতে পারি নে তাই। এখন ডালের কি করবে বলো—

—ডাল কতটা আছে দেখলি?

—লবডঙ্কা। আর মেরে-কেটে তিন জনের মত হবে—

—ক'জনের মত ডাল দিইছিলি?

—দশ জনের মত মুগের ডাল আলাদা ফাস্টো কেলাসের মুড়িঘণ্টের জন্যে দিইছি—সেকেন্ কেলাসে ত্রিশ জনের মুসুরি-খেঁসারি মিশেল ডাল—

—হাজারি ঠাকুরকে ডেকে দে—

পদ্ম ঝি হাজারি ঠাকুরকে সঙ্গে করিয়াই আনিল।

লোকটার বয়স পঁয়তাল্লিশ-ছেচল্লিশ, একাহারা চেহারা, রঙ কালো। দেখিলে মনে হয় লোকটা নিপাট ভালোমানুষ।

বেচু চক্কত্তি বলিল—হাজারি ঠাকুর, ডাল কম হ'ল কি ক'রে?

হাজারি ঠাকুর বলিল—তা কি ক'রে বলবো বাবু? রোজ যেমন ডাল খদ্দেরদের দিই, তার বেশী তো দিই নি। কম হলে আমি কি করবো বলুন।

পদ্ম ঝি ঝঙ্কার দিয়া বলিল—তোমার হাড়ে হাড়ে বদমাইশি ঠাকুর। আমি পষ্ট দেখেছি তুমি ওই খদ্দের বাবুদের মুখে রান্নার সুখ্যাতি শুনে তাদের পাতে উড়কি উড়কি মুড়িঘণ্ট ঢালছো। পয়সা-কড়িও দিয়েছে বোধ হয় বকশিশ—

হাজারি বলিল—বকশিশ এ হোটেলে কত পাই দেখছো তো পদ্মদিদি। একটা বিড়ি খেতে কেউ দ্যায়—আজ পাঁচ বছর এখানে আছি? তুমি কেবল বকশিশ পেতে দ্যাখো আমাকে।

পদ্ম বলিল—তুমি মুখে-মুখে তক্‌কো ক'রো না বলে দিচ্ছি। পদ্ম ঝি কাউকে ভয় ক'রে কথা বলবার মেয়ে নয়। ফাস্টো কেলাসের বাবুরা পুজোর সময় তোমায় গেঞ্জি কিনে দেয় নি?

—ইস্—ভারী গেঞ্জি একটা—কিনে দিয়েছিল বুঝি, পুরনো গেঞ্জি—

বেচু চক্কত্তি বলিল—যাও যাও, ঠাকুর, বাজে কথা নিয়ে বকো না। বেশী খদ্দের আসে, ডালের দাম তোমার মাইনে থেকে কাটা যাবে।

—কেন বাবু, আমার কি দোষ হ'ল এতে। পদ্মদিদি আট জনের ডাল মেপে দিয়েছে, তাতে খেয়েছে এগারো জন—

পদ্ম এবার হাজারি ঠাকুরের সামনে আসিয়া হাত-মুখ নাড়িয়া চোখ পাকাইয়া বলিল—আট জনের ডাল মেপে দিইছি—নচ্ছার, বদমাইশ গাঁজাখোর কোথাকার—দশ জনের দশের অর্ধেক পাঁচ পোয়া ডাল তোমায় দিই নি বের ক'রে?

হাজারি ঠাকুর আর প্রতিবাদ করিতে বোধ হয় সাহস পাইল না।

পদ্ম ঝি অত অল্পে বোধ হয় ছাড়িত না—কিন্তু ইতিমধ্যে খদ্দেররা আসিয়া পড়াতে সে কথা বন্ধ করিয়া চলিয়া গেল। হাজারি ঠাকুরও ভিতরে গেল।

বেলা প্রায় আড়াইটা।

আসাম মেল অনেকক্ষণ আসিয়া চলিয়া গিয়াছে।

হাজারি ঠাকুর একা খাওয়ার ঘরে খাইতে বসিল। বড় ডেক্‌চিতে দুটিখানি মাত্র ভাত ও কড়ায় একটুখানি ঘাঁটা তরকারি পড়িয়া আছে। ডাল, মাছ যাহা ছিল, পদ্ম ঝিকে তাহার বড় থালায় বাড়িয়া দিতে হইয়াছে—সে রোজ বেলা দেড়টার সময় রান্নাঘরের উদ্বৃত্ত ডাল তরকারি মাছ নিজের বাসায় লইয়া যায়—রসুয়ে-বামুনদের জন্যে কিছু থাকুক আর না থাকুক।

অন্য রসুয়ে-বামুনটা উড়িয়া। তার নাম রতন ঠাকুর। সে হোটেলে বসিয়া খায় না—তাহারও বাসা নিকটে। সেও ভাত-তরকারি লইয়া যায়।

হাজারির এখানে কেহ নাই। সে হোটেলেই থাকে, হোটেলেই খায়। রোজই তার ভাগ্যে এই রকম। বেলা আড়াইটা পর্যন্ত খালি পেটে খাটিয়া দুটি কড়কড়ে ভাত, কোনোদিন সামান্য একটু ডাল, কোনোদিন তাও না—ইহাই তাহার বরাদ্দ। ডেক্‌চিতে বেশী ভাত থাকিলে পদ্ম ঝি বলিবে—অত ভাত খাবে কে? ও তো তিন জনের খোরাক—আমার থালায় আর দুটো বেশী ক'রে ভাত বেড়ে দিও।

হাজারি ঠাকুর খাইতে বসিয়া রোজ ভাবে—আর দুটো ভাত থাকলে ভাল হোত, না-হয় তেঁতুল দিয়ে খেতাম। পদ্মটা কি সোজা বদমাইশ মাগী—পেট ভরে' যে কেউ খায়—তাও তার সহ্যি হয় না। যদু বাঁড়ুয্যের হোটেলে বেলা এগারোটার সময় রাঁধুনি-বামুন একথালা ভাত খেয়ে নেয়, আমাদের এখানে তা হবার জো আছে? বাব্বাঃ, যেমন কর্তা, তেমনি গিন্নী—(পদ্ম ঝিকে মনে মনে গিন্নী বলিয়া হাজারি ঠাকুর খুব আমোদ উপভোগ করিল—মুখ ফুটিয়া যাহা বলা যায় না, মনে মনে তাহা বলিয়াও সুখ।)

খাওয়ার পরে মাত্র আড়াই ঘণ্টা ছুটি।

আবার ঠিক বেলা পাঁচটায় উনুনে ডেক্‌চি চাপাইতে হইবে।

রতন ঠাকুর এই সময়টা বাসায় গিয়া ঘুমায়, কিন্তু হাজারি ঠাকুর চুর্ণী নদীর ধারের ঠাকুরবাড়ীতে, কিংবা রাধাবল্লভ-তলায় নাটমন্দিরে একা বসিয়া কাটায়।

না ঘুমাইয়া একা বসিয়া কাটাইবার মানে আছে।

হাজারি ঠাকুরের এই সময়টা হইতেছে ভাবিবার সময়। এ সময় ছাড়া আর নির্জনে ভাবিবার অবসর পাওয়া যায় না। সন্ধ্যা সাতটা পর্যন্ত রান্নার কাজে ব্যস্ত থাকিতে হয়, রাত এগারটা পর্যন্ত খদ্দেরদের পরিবেশন, রাত বারোটা পর্যন্ত নিজেদের খাওয়া-দাওয়া, তারপর কর্তার কাছে চাল-ডালের হিসাব মিটানো। রাত একটার এদিকে শুইবার অবসর পাওয়া যায় না, দু-দণ্ড একা বসিয়া ভাবিবার সময় কই?

চূর্ণী নদীর ধারের জায়গাটি বেশ ভাল লাগে।

ও-পারে শান্তিপুর যাইবার কাঁচা সড়ক। খেয়া নৌকায় লোকজন পারাপার হইতেছে। গ্রামের বাঁশবন, শিমুল গাছ, মাঠ, কলাই ক্ষেত, গাবভেরেণ্ডার বেড়াঘেরা গৃহস্থ-বাড়ী।

হাজারি ঠাকুর একটা বিড়ি ধরাইয়া ভাবিতে আরম্ভ করিল।

আজ পাঁচ বছর হইয়া গেল বেচু চক্কত্তির হোটেলে।

প্রথম যেদিন রাণাঘাট আসিয়া হোটেলে ঢোকে, সে-কথা আজও মনে হয়। গাংনাপুর হইতে রাণাঘাট আসিয়া সে প্রথমেই গেল বেচু চক্কত্তির হোটেলে কাজের সন্ধানে।

কর্তা সামনেই বসিয়া ছিলেন—বলিলেন—কি চাই?

হাজারি বলিল—আজ্ঞে বাবু, রসুয়ে-বামুনের কাজ করি। কাজের চেষ্টায় ঘুরছি, বাবুর হোটেলে কাজ আছে?

—তোমার নাম কি?

—আজ্ঞে, হাজারি দেবশর্মা, উপাধি চক্রবর্তী।

এইভাবে নাম বলিতে হাজারির পিতাঠাকুর তাহাকে শিখাইয়া দিয়াছিলেন।

—বাড়ী কোথায়?

—গাংনাপুর ইস্টিশানে নেমে যেতে হয় এড়েশোলা গ্রামে।

—রাঁধতে জানো?

—বাবু একদিন রাঁধিয়ে দেখুন। মাংস, মাছ, যা দেবেন সব পারবো।

—আচ্ছা, তিন দিন এমনি রাঁধতে হবে—তার পর সাত টাকা মাইনে দেবো আর খেতে পাবে। রাজী থাকো আজই কাজে লেগে যাও।

সেই হইতে আজ পর্যন্ত সাত টাকার এক পয়সা মাহিনা বাড়ে নাই। অথচ খদ্দের বাবুরা সকলেই তাহার রান্নার সুখ্যাতি করে, যদিচ পদ্ম ঝিয়ের মুখে একটা সুখ্যাতির কথাও সে কখনো শোনে নাই, ভালো কথা তো দূরের কথা, পদ্ম ঝি তাহাকে আঁশবঁটি পাতিয়া পারে তো কোটে। গরীব লোক, এ বাজারে চাকুরি ছাড়িয়া দিয়া যাইবেই বা কোথায়? যাক, তাহার জন্য সে তত ভাবে না। তাহার মনে একটা বড় আশা আছে, ভগবান তাহা যদি পূর্ণ করেন কোনোদিন—তবে তাহার সকল খেদ দূর হইয়া যায়।

হোটেলের কাজ সে খুব ভাল শিখিয়া লইয়াছে। সে নিজে একটা হোটেল খুলিবে।

হোটেলের বাহিরে লেখা থাকিবে—